সাহসের মন্ত্র

(শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নারীবিষয়ক প্রাগ্রসর চিন্তা)

আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

পৃথিবী এখন দুভাগে বিভক্ত; ইসলামি শক্তি আর ইসলামবিরোধী শক্তি। সকল ইসলামবিরোধী শক্তি সংঘবদ্ধ হয়ে পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে চায়। ইসলামকে পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাসের সাথে মিলিয়ে একটা মিথ তৈরি করেছে তারা। অন্যদিকে, ইসলাম তার স্বভাবনিয়মে এই জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে অব্যাহতভাবে প্রজ্জ্বলিত রাখতে সদা তৎপর। শত বাধা-বিপত্তি ও ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে মুসলমানরা ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে ইসলামের আলো পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব, বিভক্তি ও লড়াই তাই স্পষ্ট ও দৃশ্যমান। পৃথিবীর শুরু থেকে তা অব্যাহতভাবে বিরাজমান।

মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যতা প্রতিনিয়ত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মুসলমান হিসেবে আমরা যারা এই লড়াইয়ে ইসলামকে বিজয়ী করতে চাই, তাদের প্রথমত জ্ঞানের জগতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার কোনো বিকল্প নেই। ইসলামবিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করার পূর্বে তাই মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বোঝাপড়া বেশি জরুরি। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে ইসলামের সাযুজ্য খুঁজে বের করা সময়ের দাবি। তাই জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা দূর করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ জন্য আমাদের সোনালি ইতিহাস থেকে প্রেরণা খুঁজে ফিরতে হবে।

এসব নিয়ে ভেবেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজচিন্তক জনাব আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ। একুশ শতকের জাহেলিয়াতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তরুণদের সাহস জোগাতে চেয়েছেন। আশু করণীয় বাতলে দিয়েছেন। চিন্তার স্পষ্টতা আনার একটা প্রয়াস তুলে ধরেছেন। লিখেছেন 'সাহসের মন্ত্র'। এই গ্রন্থ কোনো সাহিত্যের রসালো উপস্থাপনা নয়; চিন্তাশীল তারুণ্যের ভাবনার দরজায় করাঘাত করার একটা চেষ্টা মাত্র।

আশা করছি– 'সাহসের মন্ত্র' পড়ে উজ্জীবিত হবে মুসলিম তারুণ্য। বইটির সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আগামী দিনের পৃথিবী দ্বীন ইসলামের হোক।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
৩ নভেম্বর, ২০১৯

লেখকের কথা

মানবসভ্যতা আজ এক চরম সংকটকাল অতিক্রম করছে। এটিকে ব্যাপক বিশ্লেষণ করে স্যামুয়েল পি হান্টিংটন একটি বই লিখেছেন, যার শিরোনাম *The Clash of Civilization and The Remaking of World Order* বা *সভ্যতার দ্বন্দ্ব এবং নতুন বিশ্বব্যাবস্থার পুনর্নির্মাণ*। সেই থেকে বিশ্বময় ধর্ম ও সভ্যতাসমূহের মধ্যে এক ধরনের অঘোষিত ক্রুসেড শুরু হয়েছে। আর এই একতরফা লড়াইয়ের শিকার হচ্ছে প্রাচ্যের সভ্যতাসমূহ; বিশেষ করে ইসলামি সভ্যতা। পশ্চিমা সভ্যতা স্বকল্পিত বিভাজন-রেখা তৈরি করে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে ইসলাম আর প্রাচ্য এক ও অভিন্ন। সবখানে এখন তারা উন্মত্ত ষাঁড়ের মতো কারণে-অকারণে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। পায়ে পা দিয়ে লড়াই বাধাতে চাইছে। অথচ একটু পেছন ফিরে তাকালে সাদা চোখেই তারা দেখবে– সভ্যতাসমূহ একে অন্যের পরিপূরক। ইতিহাসে তাদের হাতে হাত রেখে চলতে দেখা যায়।

এই দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিতে বিশ্বমোড়ল এবং তাদের আশীর্বাদপুষ্ট মানবতা ও সভ্যতার দুশমন খুনিচক্রের মোকাবিলা করা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সবচেয়ে বেশি দরকার প্রত্যয়দীপ্ত মন, বুক ভরা সাহস আর সাহসকে উজ্জীবিত রাখার মতো 'মন্ত্র'সমূহ। হিংসা-বিদ্বেষ নয়; ভালোবাসা ও সহনশীলতা, জিঘাংসা নয়; অকাতর ক্ষমা ও দুআ, সংকীর্ণতা নয়; আকাশ সমান উদারতা এবং ভয়-ভীতি নয়; উন্মত্ত ঊর্মিমালায় ভরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ওপারের বেলাভূমিতে শান্তির সবুজ পতাকা উড়ানোর দুঃসাহস।

সংস্কৃতির ছদ্মাবরণে বিগত দুশো বছর ধরে গোটা বিশ্বে চলছে বিষময় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন। চলেছে অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং সাংস্কৃতিক গোলামি। সেই নির্যাতন, নিপীড়ন আর গোলামির জিঞ্জির ভেঙে-চুড়ে মানবতার মুক্তি নিশ্চিত করতে চাই সিংহদিল সমর্পিত মানুষের দল।

অসুরীয় লড়াই নয়; বরং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানসম্পন্ন একদল সর্বোসুন্দর মানুষের হাতে থাকবে শান্তির পতাকা। তারা মুখ থুবড়ে পড়া পশ্চিমা সভ্যতাকে দেখাবে জ্ঞানের শিখায় প্রজ্জ্বলিত মশাল আর মুক্তির মোহনামুখী ঐতিহ্য সমৃদ্ধ সুপ্রশস্ত রাজপথ।

এই বইটি কোনো তাত্ত্বিক বই নয়; বরং লড়াইয়ের সহজ-সরল বিন্যাস। পাঠক যদি এর দ্বারা সামান্যও আলোকিত বা উদ্বুদ্ধ হন, তাহলেই লেখকের সার্থকতা। প্রকাশক এই বইটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাধিত করলেন। গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে সাহসী, দরদি ও প্রত্যয়ী অভিভাবকের ভূমিকা পালন করুক।

বইয়ের কোথাও কোনো ভুল-ত্রুটি চোখে পড়লে দয়া করে আমাদের জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

সাহসের মন্ত্র পাঠে প্রতিটি হৃদয় হোক নতুন আলোয় উদ্ভাসিত, নতুন চেতনায় শাণিত, প্রশান্ত ও ঋদ্ধ।

আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ
৫ অক্টোবর, ২০১৯

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব

সাংস্কৃতিক গতিধারা

সাংস্কৃতিক আন্দোলন; ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও নেতৃত্ব ১৩
করণীয় কর্মসূচি ২৩
সাংস্কৃতিক আগ্রাসন; প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ৩২
আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্য ৩৯
ললিতকলা ও দাওয়াত ৪০
সংস্কৃতি ও সরকার ৬০

দ্বিতীয় পর্ব

জ্ঞানের শক্তি

সাহসের মন্ত্র ৭৯
ইসলামি শিক্ষা আন্দোলন; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ৯৩
বিজ্ঞানে মুসলমান ১০৬
নারীর অধিকারে ইসলাম; বিভ্রান্তি ও বাস্তবতা ১২৩

তৃতীয় পর্ব

ইতিহাসের পথে

ইতিহাসের সাথে ঐতিহ্যের পথে ১৬৩

সাংস্কৃতিক আন্দোলন : ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও নেতৃত্ব

সাংস্কৃতিক আন্দোলন যেকোনো বিপ্লবী আন্দোলনের পূর্বশর্ত। মহানবি ﷺ-এর নবুয়তের ২৩ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জাজিরাতুল আরবে ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে বিজয়ী হয়। নবুয়তের প্রথম ১৩ বছর রাসূল ﷺ ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। এই সময়ে যারা দাওয়াত কবুল করেন, তাদের জন্য কোনো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক কর্মসূচি প্রদান করা হয়নি; বরং সে সময় কেবল সাংস্কৃতিক কার্যক্রম করা হতো। এ সাংস্কৃতিক কর্মসূচিগুলো হচ্ছে–

- মানুষকে তার বিশ্বাস পরিশুদ্ধ করার আহ্বান। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, একত্ব ও সার্বিক গোলামির প্রতি আহ্বান।
- মানবতার বন্ধু, শিক্ষক, নেতা ও মুক্তিদাতা হিসেবে রাসূলকে পূর্ণ অনুসরণের আহ্বান।
- মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হিসেবে 'আখিরাত'-এর প্রতি বিশ্বাসের আহ্বান।

মূলত সংস্কৃতি হচ্ছে বিশ্বাসের প্রতিফলন। সে জন্যই নবি করিম ﷺ তাঁর আন্দোলনের প্রথম কর্মসূচি হিসেবে এই সংস্কৃতির বিষয়টি গ্রহণ করেছেন। এটা রাসূল ﷺ নিজের ইচ্ছায় করেননি; বরং আল্লাহই মিশন হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কুরআনের ভাষায়–

> 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদেরই থেকে একজন রাসূল আবির্ভূত করেছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতগুলো পড়ে শোনান, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব, হিকমত ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন। আর তারা ইতঃপূর্বে অবশ্যই স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।'
> সূরা জুমুআ : ২

সংস্কৃতির প্রকৃত কাজ

বিশ্বাস, চিন্তা, কর্ম ও আচরণের পরিশুদ্ধিই সংস্কৃতির লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের কর্মসূচি ঠিক করে অগ্রসর হতে হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে। ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর

নেতৃবৃন্দ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অগ্রাধিকারের (Priority) বিষয়টি নিয়ে এখনও দ্বিধান্বিত। এ দ্বিধার অবসান হওয়া খুবই জরুরি।

ইসলামের প্রথম যুগে এসব দ্বিধা ছিল না। খোলাফায়ে রাশেদিনের পর অতিমাত্রায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত মুসলিম শাসকদের মাঝে সাংস্কৃতিক বিচ্যুতি জন্ম নেয়। পরবর্তীকালের ইমাম ও মুজতাহিদগণ মূলত সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দেন। তখন তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চা করার সুযোগ বা অবকাশ কোনোটিই পাননি। তবে সাধারণের মাঝে আকিদা, তাজকিয়া ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান বিষয়ে সচেতনতার জন্ম দেন।

গোটা পৃথিবীতেই মুসলিমরা অসংখ্য সাংস্কৃতিক সংকট অতিক্রম করছে। এসব সংকট উত্তরণ করে আবারও গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে হলে বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। বিশ্বব্যাপী ইসলামি জাগরণের সম্ভাবনা যতটুকু, তার সামনে সমস্যার পাহাড়ও সে তুলনায় কম নয়। বাংলাদেশের ইসলামপন্থি দলগুলোর সামনে বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যেসব প্রয়াস চলে আসছে, কেবল তাতেই সীমাবদ্ধ থাকলে বিজয় সুদূর পরাহত। এ জন্যই সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ও আগ্রাসনের মাত্রা উপলব্ধি করে আগামী দিনের কর্মসূচি নির্ধারণ করতে হবে।

ইসলামি আন্দোলন মূলত সাংস্কৃতিক আন্দোলন। সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার জন্য কতিপয় সংগঠনের জন্ম হয়েছে। এসব সংগঠনগুলোর নানান কর্মসূচিও রয়েছে। সাংগঠনিক কর্মসূচিসমূহ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট ও যথার্থ কি না তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

আগ্রাসনের কবলে সংস্কৃতি

একটি জাতিকে সাংস্কৃতিকভাবে পঙ্গু করে দিতে পারলেই সে চিরস্থায়ীভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করে। এ জন্যই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তি সব সময় আমাদের সংস্কৃতিকে প্রথম টার্গেট করেছে। শুরুতেই তারা আঘাত হেনেছে আমাদের 'বিশ্বাস'-কে। শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজিয়েছে, যেন ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ধর্মীয় বিশ্বাস প্রবল না হয়; বরং ধর্মহীনতার দিকে ধাবিত হয়। তারা যেন ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে উঠে, শিক্ষাব্যবস্থাকে সেভাবেই সাজানো হয়েছে।

আমরা স্বাধীন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারিনি। ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে এখনও চালু আছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে বটে, কিন্তু সেই দেশের মাটি, মানুষের কৃষ্টি-কালচার, ধর্মীয় অবস্থান, বোধ ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা এখনও নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করতে পারিনি। ফলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। আমরা আমাদের আকাশ সাংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসে আছি। আমাদের আকাশ এখন অন্যের দখলে।

বাংলাদেশের আকাশে চাইলেই যেমন আমাদের ইচ্ছামতো চ্যানেল করতে পারছি না, তেমনি পারছি না কোনো স্বাধীন প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তুলতে। এসবের অধিকাংশই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হাতে একটি নির্দিষ্ট দেশের অর্থানুকূল্যে গড়ে ওঠা। এসব পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশনা সংস্থা পাঠক-

পাঠিকাদের বৃহদাংশের মনন ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে ধর্মহীনতার দিকে আকৃষ্ট করছে। বিশেষ সাংস্কৃতিক অবয়ব প্রদানের অপচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বিভিন্ন সাপ্তাহিক পত্রিকার ঈদ সংখ্যাগুলোর উপন্যাসসমূহের ওপর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে– প্রায় সব উপন্যাস এবং বিজ্ঞাপনে ফ্রি-সেক্স, ফ্রি-মিক্সিং, মহিলাদের লো-কাট, স্লিভলেস ব্লাউজ ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার ও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এতে করে আমাদের নারী সমাজে এগুলোর চর্চা বৃদ্ধি পাওয়াটাই যুক্তিসম্মত; হয়েছেও তাই।

অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক ও একবিংশ শতাব্দীর চলমান দুই দশক সাইবার সংস্কৃতির প্রবল ধাক্কায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত।

মূলত, সাধারণ মানুষ নায়ক-নায়িকাদের জীবনাচারকে মডেল মনে করে। পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষণ-সম্বোধন, আচার-অনুষ্ঠান সবছিুতেই ত্বরিত প্রভাব ফেলে শো-বিজ জগতের কর্মীরা। ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, রেডিও, টিভি, সিনেমা এবং সাইবার ওয়ার্ল্ড এক অতি ক্ষমতাধর গণমাধ্যম, যা কিনা প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনা ও কর্মপ্রবাহকে প্রভাবিত করে। মঞ্চ কর্মীদের কার্যক্রমের প্রভাবকেও আমরা খাটো করে দেখতে পারি না। বল্গাহীন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রভাবে আমাদের যুবসমাজ প্রতিনিয়ত হলিউড, বলিউডের নায়ক-নায়িকাদের রুচি ও স্বভাব দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছে। যারা এ প্রভাব থেকে মুক্ত, তারা অতি সাবধানি কিংবা বেখবর।

সামর্থ্যবানদের বিয়েতে দশটা অনুষ্ঠান হয়। আর এর প্রতিটিতেই বেপরোয়া পর্দাহীনতা, খরচের বাহুল্যতা, যৌতুকের পীড়ন যেন স্বাভাবিক ঘটনা। এগুলো কেন ঘটে? মুসলমান ছেলেমেয়ের বিয়েতে ডিজে পার্টি কেন হবে? বিভিন্ন ধর্মীয় দিবসগুলোতে কেন মোমবাতির সারি প্রজ্জ্বলিত করা হবে? জন্মদিনে কেক কাটা, মোমবাতি নেভানো এ সংস্কৃতি কাদের? কেনই-বা মঙ্গল প্রদীপ দিয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোর উদ্বোধন করা হয়? এসবই আগ্রাসনের সহজতম মহড়া।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, বিদেশি, চ্যানেল, এফ.এম রেডিও-এর পাশাপাশি কিছু এনজিও আমাদের শ্বাশত পারিবারিক প্রথা, অটুট বন্ধন ও সুশান্তির পরিবেশকে বিঘ্নিত করার জন্য 'কীসের বর, কীসের ঘর' জাতীয় বক্তব্য প্রদান করে আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তিভূমিতে আঘাত হানা শুরু করেছে। পাশ্চাত্যের মতো বৈবাহিক বন্ধনমুক্ত লিভ টুগেদার একটি শ্রেণির কাছে বেশ মজাদার ঠেকছে। কিন্তু এর বিষক্রিয়ার ফল সম্পর্কে ওরা আজও উদাসীন। লাজ-নম্র বাঙালি মুসলিম নারীদের লজ্জার আবরণ ছিনিয়ে নিয়ে 'নারী জাগরণের' নামে পর্দাহীনতার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। অথচ বাঙালি মুসলিম নারীবাদীদের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত বহু আগেই (১৮৮০-১৯৩২) পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন– অবরোধ মুক্তি মানে পর্দাহীনতা নয়। নারী পর্দার ভেতরে থেকেও যে বিস্ময়কর ভূমিকা রাখতে পারে আজকের ইরান, সুদান, তিউনেসিয়া, ইউরোপ-আমেরিকাসহ মুসলিম বিশ্বের প্রগতিশীল নারীসমাজ তার প্রমাণ।

আমাদের নাটক, গল্প-উপন্যাসে আমাদের জীবনানুগ বাস্তবতার ছবি এখন আর তেমন দেখা যায় না। কতিপয় আরোপিত বাস্তবতার ছবি এবং এমন এক কল্পিত বাস্তবতা দেখানো হয়, যেখানে

পাওয়া যায় 'শ্রেণি সাম্যের' কথা ও কল্পিত 'ফতোয়ার' গল্প। কিন্তু শতকরা ৮৬ ভাগ মানুষের দৈনন্দিন কৃত্যের চিত্র তাতে পাওয়া যায় না।

আমাদের সংস্কৃতিকে যারা আগ্রাসী এবং অপশক্তির হাতে তুলে দিতে চায়, তারা প্রস্তুতি সহকারে অতি কৌশলে সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রক গণমাধ্যমসমূহে পরিকল্পিত দখলদারি কায়েম করেছে। বিজ্ঞাপন জগৎকে পুরোপুরি হাতিয়ে নিয়েছে। চোরাচালানি-মাফিয়াচক্রের মতো এদেরও একটি চক্র আছে, যার হাত থেকে আমাদের সংস্কৃতির বেরিয়ে আসা খুব কঠিন। সাম্প্রদায়িকতার দোহাই দিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞাপন বন্ধের ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু কই, মুসলমানদের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তো কোনো বিজ্ঞাপন কখনো বন্ধ হতে শুনিনি বা দেখিনি।

যেসব ভারতীয় ছবি বা বিজ্ঞাপন আমরা দেখি, তাতে প্রায়শ দেব-দেবী, পূজা-অর্চনা ও মিথ, নায়ক-নায়িকার অলৌকিক বিজয় দেখানো হয়। কেবল মুসলমানদের ধর্মীয় কোনো বিষয় চলে এলেই সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক চরিত্র গেল গেল– রব ওঠে। এর হেতু আদৌ বোধগম্য নয়। এ ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের হীনমন্যতার দিকটিও কম আশ্চর্যজনক নয়।

বস্তুত আগ্রাসনের পথ আমরা নিজেরাই খুলে দিয়েছি। সংস্কৃতির দরজা-জানালায় খিল আঁটা যায় না। আলো-বাতাসের মতো চারদিকের সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি এখানে ঢুকে পড়ে। দুর্বল অবকাঠামোর ঘর-বাড়ি যেমন ঝড়ো হাওয়া ও প্রচণ্ড আলোর বিস্ফোরণে ধ্বসে যায়, তেমনি আমাদের সংস্কৃতির বুনিয়াদ তাওহিদ, আখিরাত ও রিসালাতের ওপর থেকে সরে যাচ্ছে বলেই আমরা আগ্রাসনের দুর্বল শিকারে পরিণত হচ্ছি।